সামরিক-অসামরিক পেটোয়াতন্ত্র

মানস চৌধুরী

অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম। ভাবনার প্রেক্ষাপটও ছিল। এরশাদ বিতাড়নের পর, কথিত গণতন্ত্রের কালেও, নানান শিক্ষিত মহলে এই প্রশ্ন নিয়ে আলাপ হয়েই থাকে – 'বাংলাদেশে কি সামরিক শাসন আবার আসবে?' সত্যি কথা বলতে, এই জুজুবুড়িটা জবরজং যে গণতন্ত্রটাকে অনেকে মিলে আবিষ্কার করেছেন, তাকে তোষামোদ করতে ভালমত ব্যবহার করাও হয়ে থাকে। মুলতঃ প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে নাখোশী ব্যক্ত করতে গিয়ে এটা একটা ধারাবাহিক উসখুশ ছিল। সারাংশটা হচ্ছে: যদি সদ্যলব্ধ গণতন্ত্রের আরামদায়ক দেখভাল না করা যায়, তাহলে সামরিক শাসন চলে আসবে। 'সামরিক শাসন' ধারণাটা একটা প্যাকেজ প্রোগ্রামের মতো মাথায় কিছু সিরিজ-আইডিয়ার ফল, আবার কারকও। এর সঙ্গে কিছু ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার যেমন যোগসুত্র আছে, আবার সেইসুত্রে বেশ কল্পনাও আছে। শব্দটা সামরিক বাহিনী প্রসঙ্গে এমন এক রাখ-ঢাকের বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত, যে সেটা অসঙ্গতও নয়। এই জুজুবুড়ির ভয় বা আশঙ্কা থেকে আমরাও বুঝতে পারে গণতন্ত্র দেশে থাকছে ইদানীং। কিন্তু 'সামরিক শাসন চলে আসতে পারে' – এই থিসিসটা কখনোই সুবিধার লাগেনি আমার। কেন আসবে? কীসের থেকে আমাদের মনে হয় যে রাষ্ট্রের সামরিকত্ব হাওয়া হয়ে গেছে? নাকি মানুষজনকে সন্ত্রস্ত করে রাখার মিলিটারিত্ব আরো যুৎসইভাবে বিকেন্দ্রীকৃত হচ্ছে? (অবশ্য শুনেছি, বিকেন্দ্রীকরণ নাকি গণতন্ত্রের জন্য ভাল।)

৩০শে মে ২০০৫ পত্রিকার (এখানে *প্রথম আলোর* কথাই হচ্ছে) শিরোনামগুলোর বিন্যাস, কাকতালীয়ভাবেই হয়তো, ভাববার মতো। নতুন কিছু নয়। কিন্তু, অনেক দিন ধরেই ভাবতে থাকা প্রসঙ্গ নিয়ে হঠাৎ দু'চার কথা বলার মতো ভাল একটা উসিলা বটে। একটা খবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী বাসচাপা পড়বার অনুবর্তীতে ক্যাম্পাসের প্রতিবাদী সমাবেশে ছাত্রদলের হামলা। যথাপুর্ব্বং! এই বীর পুঙ্গবদের কীর্তির সঙ্গে এবারে যোগ হয়েছে ঢা. বি. শিক্ষকদেরও কারো কারো সামিল হওয়া, অন্ততঃ পত্রিকার খবরানুযায়ী। বটেই তো! তা না হলে আর শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে এতদিন ধরে কী বলবার চেষ্টা করছে লোকজন! তবে মাথা-ভারী শিক্ষক নিয়োগ নিয়েই মাথাব্যথা করা হয় বেশি। গুন্ডা-শিক্ষক নিয়ে আলাপ কম হয়। এটাও সত্য যে, সাফ-মাথার শিক্ষক আর গুন্ডা-শিক্ষক এই দুই অপশনের মধ্যেই যদি শিক্ষক নিয়োগ সীমিত থাকে, তাহলে আসলে কোন্‌টাতে আমাদের বেশি অসুবিধা হচ্ছে, বা কোনটাতে আমার আপত্তি, এই ফয়সালায় পৌঁছানো সহজ কাজ বিশেষ নয়।

অন্য একটি খবর হলো 'র‍্যাব'-এর জন্য শৃ•খলাবিধি প্রণয়ন হচ্ছে । এ এক নির্মম রসিকতা! একটা বিশেষ ক্ষমতার পেটোয়াবাহিনী রাস্তা ঘাটে, প্রান্তরে-শহরে এতগুলো *ক্রস-ফায়ার* ঘটানোর পরে একটা বিধিমালা প্রণয়ন হচ্ছে। এই দেখানোটা কাকে দেখানো হচ্ছে? র‍্যাব এবং পুর্বসুরী 'বিশেষ' বাহিনীগুলোকে প্রজা-শাসানোর পেটোয়াবাহিনী বললে কি অত্যুক্তি হবে? অবশ্য এই দাবিনামা সামনে আনলে সরকার বা র‍্যাব প্রশাসকেরা নাখোশ হোন বা না-হোন, অনেক রুচিশীল মধ্যবিত্ত যে অখুশি হবেন তাতে বিশেষ সন্দেহ নেই। একথা সত্য যে, প্রেস র‍্যাব নিয়ে একটা বিশেষ কটাক্ষের স্বরে বেশ অনেকদিন ধরেই আছে। কিন্তু একথাও সত্য যে 'র‍্যাব' ও ইত্যাকার বাহিনী ময়দানে নামার পর থেকে এর প্রতি পরোক্ষ প্রশয় থেকে শুরু করে প্রত্যক্ষ সমর্থন মহানগরের ভদ্রলোকেরা জানিয়েছেন। এসব কথা লজ্জা না-পেয়ে সরাসরি আলাপ হওয়াই ভাল। তাঁদের 'নাকি' জানমাল এতে হিফজত হচ্ছে। এগুলো প্রকাশিত, উদ্ভাসিত প্রতিক্রিয়া। রাষ্ট্রের সামরিকত্ব নিয়ে সাধারণ একটা বুদ্বুদ আলাপ আপনাদের সঙ্গে শরিক হতে চেয়েছিলাম। যে আয়েশের সঙ্গে খুনী একটা বাহিনীকে সম্মতির বৈধতাপত্র দেয়া হয়েছে, সেই আয়েশই বাংলাদেশে পেটোয়াতন্ত্রের ভিত্তি দিয়েছে, দিয়ে চলেছে এখনো।

এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে এখন সামরিক-অসামরিক অলিগ্যার্কিক পেটোয়াতন্ত্র চলছে। বিষয়টা মিলিটারি উর্দিতে ক্ষমতা পুঞ্জিভবনের নয়। এভাবে দেখলে আমরা ভুল করব। বিষয়টা হচ্ছে সিভিল ছদ্মবেশে রাষ্ট্রে মিলিটারিতন্ত্র চলতে থাকা। 'চিহ্নিত সন্ত্রাসী' 'রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ' – এইসব ভাষামালার আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে প্রতিটা হত্যা এবং আক্রমণের পদ্ধতিগত সহিংসতা। ক্যাম্পাসের পেটাইটা, পেটাইগুলো এইসব গুরুতর আক্রমণের মধ্যে একেবারেই পেছনসারির। জেনেও সেটাকে আলাপসূত্র হিসেবে তুললাম মাত্র।

এবারে তৃতীয় খবরটার দিকে দৃকপাত করুন। সেমিনারে বাংলাদেশের 'দুর্নীতি' বিলোপের পথ আবিষ্কার করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশন। বলাই বাহুল্য অন্যদের মধ্যে অধ্যাপক ইউনুস খবর সংস্থার মনোযোগ পেয়েছেন বেশি। কিন্তু সেটা মুল প্রসঙ্গ নয়। গত ক'টা বছর এই শব্দটাকে পুনরাবিষ্কারের পর থেকে বাংলাদেশের সিভিল সমাজ বর্তে গেছেন। আভিধানিক ভাবে একে অনেক রকম ক্রিয়ার সঙ্গেই যুক্ত করে দেখা যায়। কিন্তু ব্যঞ্জণার দিক থেকে, প্রয়োগবিচারে শব্দটির সুনির্দিষ্ট অর্থ যা সংবহিত হয় সেটা পাঠকমাত্রই জ্ঞাত। তা হচ্ছে: রীতিবহির্ভুতভাবে আয়-ব্যয়ের খতিয়ান পরিচালন; পরিশেষে অর্থ পরিসীমিত হয় 'ঘুষ'-এ এবং কারক হিসেবে নন্দঘোষ দাঁড়ান সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারিরা। আমার বক্তব্য এই নয় যে সরকারী কর্মচারিদের একাংশ ঘুষ খান না, কিন্তু এটাও আমার বক্তব্য যে বে-সরকারী মঙ্গলকর্মীদের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণটা এত সোজা নয়। আর সেটাকেই বাংলাদেশের এক নম্বর সঙ্কট সাব্যস্ত করা বেশ চিন্তিত (অথবা আবারো কাকতালীয়) প্রজেক্ট। টিআইবি বা সাধারণভাবে যে-কোনো এনজিও সরকারি কর্মচারিদেরকে দায়ী হিসেবে আবিষ্কার করেন কেন সেটা বোধগম্য। লক্ষণীয় ইউনুস সাহেবও তাঁর বাসনা ব্যক্ত করেছে টিআইবি মেরিটলিস্টের ১ নম্বর জায়গা থেকে সরতে পারাকে। কিন্তু সরকার বে-সরকার একত্রে বসে বসে যখন কথিত অনাবিস্কৃত 'দুর্নীতিবাজ' কর্মচারিদের দিকে ইঙ্গিত করতে থাকেন, তখন কিন্তু সন্দেহ হয় যে কেউই চান না আমরা মুল সমস্যাটা ধরে ফেলি। বাংলাদেশ এখন পেটোয়া-অলিগ্যার্কির হাতে চলছে।

– **মানস চৌধুরী**

হিগাশি-হিরোশিমা। ৩০শে মে, ২০০৫